OPEN ACCESS

*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 28*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 238 - 244*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

***Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)***
***A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture***
*Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 238 - 244*
*Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in*
*(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848*

# কয়লাখনি অঞ্চলের লৌকিক দেবী চণ্ডী

ড. শিখা হালদার
আসানসোল, পশ্চিমবঙ্গ
Email ID : shikhahalder2@gmail.com

***Received Date*** *21. 09. 2024*
***Selection Date*** *17. 10. 2024*

***Keyword***
*Coal Mine Culture, Devi Chandi, Religious Passion, Expansion of Chandi.*

***Abstract***

*Aryan culture is associated with the history of the land of Raha. The history of this Aryan culture is intertwined with the history before the start of coal mining. Most of Rahar's coal mining areas are villages and some towns. These cities are mainly industrial areas built around industry. On the other hand, the ancient secular culture of coal mining continues in the villages. The people of the remote areas here have a simplicity, a way of life built on faith and devotion. Among the mundane gods and goddesses of the coal mining region of Rahar, Goddess Chandi has the widest reach and popular belief. There is no specific idol or temple of Devi Chandi in the mundane area of the coal mining area. In most cases, under the tree, vermilion stone blocks or earthen elephant-horse symbolizes the goddess. The existence of many secular deities can be traced to the west of the coal mining region. There are hundreds of 'thans of Devi Chandi all over the region. Hidden within this religion is the history, culture and social status of mining life. Life in rocky mining areas is a constant danger. For those who spend most of their lives cutting coal in pits, their lives are full of uncertainty, poverty and severe disease. In the crisis of these people who live far from the light of education, the only refuge is the thought and worship of Goddess Chandi. Lok devi Chandi has its own 'than' in almost every village built around the industrial city of Asansol-Raniganj-Durgapur in the western part of Bengal or in the villages adjacent to mines in this region. In most cases village goddess Chandi is worshiped by the social community. People of Bauri, Dom, Mochi, Jele, Kaivarta communities are the original worshipers and worshipers of Chandi. So in most cases the ingredients of Puja are liquor, meat and khichuri. However, along with the evolution, religious beliefs and thoughts are also deconstructed. Goddess Chandi is not limited to the Antyaj community, Chandi's worship and fasting is also seen among the middle-class community in the mining areas.*

*The name of Narankuri Colliery adjacent to Raniganj coal mining area is well known. Prince Dwarkanath Tagore established his Car and Tagore Company on the banks of the Damodar River. Goddess Mathura Chandi temple is in this area. This goddess is still worshiped by the tribals. This is how the Brahminical culture got mixed with secular culture. There are many more such legends spread in the villages and towns of Rahad region. In fact, the red zone is the domain of Chandis. These Chandis have maintained their existence*

*in the trees and forests since ages ago. Chandira has provided psychological support to the people in the mining area.*

## Discussion

রাঢ়বঙ্গের কয়লাখনি অঞ্চলের মাটির একটি নিজস্ব গন্ধ আছে। রাঢ়ের মাটির ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে অনার্য সংস্কৃতি। কয়লাখনি শুরু হওয়ার পূর্ববর্তী ইতিহাসের সঙ্গে এই অনার্য সংস্কৃতির ইতিহাস জড়িত। কয়লাখনির খননের কাজ শুরুর পর এই অঞ্চলের মাটির রং বদলেছে যেমন, তেমন বদলেছে সাংস্কৃতিক আবহ। কয়লাখনিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সংস্কৃতিই বর্তমান খনি অঞ্চলের সংস্কৃতি হলেও প্রাচীন সংস্কারের ধারাটি আজও অব্যাহত আছে বিভিন্ন মাধ্যমে। ভিনদেশি শ্রমিক ও ব্যবসায়ীদের আগমনে কোনো নির্দিষ্ট সংস্কৃতি এখানে এককভাবে প্রতিস্থাপিত হতে পারেনি। সংমিশ্রণের আবহেই গড়ে উঠেছে খনি অঞ্চলের সংস্কৃতি।

রাঢ়ের কয়লাখনি অঞ্চলের মধ্যে অধিকাংশই গ্রাম এবং কিছু শহর। এই শহরগুলি মূলত শিল্পকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা শিল্পাঞ্চল। অন্যদিকে গ্রামগুলির মধ্যে রাঢ়ের প্রাচীন লৌকিক সংস্কৃতির ধারাটি অব্যাহত। এখানের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের মধ্যে আছে সরলতা, জীবনযাত্রার মধ্যে আছে বিশ্বাস ও ভক্তির নির্মাণ। মাটির গন্ধ-মাখা এই বিশ্বাস ও ভক্তি থেকে জন্ম হয়েছে বহু আঞ্চলিক দেবতার। খনি অঞ্চলের গ্রামের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে আছে এইরকম বহু দেবদেবী। এই ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কারের ওপর বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসও অনেকটা নির্ভরশীল।

রাঢ়ের কয়লাখনি অঞ্চলের লৌকিক দেবদেবীদের মধ্যে দেবী চণ্ডীর ব্যাপ্তি ও জনবিশ্বাস বহুলাংশে বিস্তৃত। পুরাণমতে দেবী চণ্ডীর উৎস আদ্যাশক্তি মহামায়ার অংশ থেকে। তাঁর একটি নির্দিষ্ট রূপকল্পনাও আছে। সেই মূর্তি অষ্টভূজা বা কখনও চতুর্ভূজা। ভারতবর্ষের বেশ কিছু জায়গায় দেবী চণ্ডীর সুনির্মিত মন্দির আছে। এই ধরণের চণ্ডীর আরাধনার সঙ্গে পুরাণের ভাবনা মিশ্রিত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। কিন্তু রাঢ়ের কলাখনি অঞ্চলে চণ্ডীর যে আরাধনা করা হয় তিনি আঞ্চলিক-লৌকিক দেবতা। প্রাবন্ধিক অমর চট্টোপাধ্যায় তাঁর কয়লাখনি অঞ্চলের লৌকিক দেবদেবী বিষয়ক আলোচনায় বলেছেন—

> “মার্কণ্ডেয় পুরাণে যিনি মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গা, তিনিই দেবী চণ্ডী। আবার উপজাতিদের মধ্যে ওরাওঁ সম্প্রদায়ের লোকেরা ‘চাণ্ডী’ নামে এক শিকারের দেবীর পূজা করে থাকেন। কালক্রমে পুরাণের চণ্ডী এবং অনার্যদের ‘চাণ্ডী’ একাকার হয়ে মিলেমিশে জন্ম হয়েছে বাংলার মঙ্গলকাব্যের দেবী চণ্ডীর। ... কিন্তু ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি অনেক জায়গায় ধীরে ধীরে এই লৌকিক দেবীকে আত্তীকরণ করে নিয়ে তাঁকে হিন্দু আচার আচরণের গণ্ডিতে বেঁধে ফেলেছেন। যদি আসানসোল ও দুর্গাপুর অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামে অনুসন্ধিৎস মন নিয়ে পরিভ্রমণ করা যায়, তাহলে এর স্বপক্ষে ভুরি ভুরি প্রমাণ পাওয়া যাবে। দেবী এখানে নানা নামে ভূষিতা। যেমন—ডাকাই চণ্ডী, ওলাই চণ্ডী, খেলাই চণ্ডী, মুক্তাই চণ্ডী, মথুরা চণ্ডী, নাগরাজ চণ্ডী ইত্যাদি।”[১]

কয়লাখনি অঞ্চলের লৌকিক পরিসরে দেবী চণ্ডীর নির্দিষ্ট কোনো মূর্তি বা মন্দির নেই। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই গাছের তলায় সিঁদুরলেপা প্রস্তরখণ্ডে বা মাটির হাতি-ঘোড়া দেবীর প্রতীক। এই পুজোয় উচ্চারিত হয় না কোনো আর্যমন্ত্র, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কোনো ব্রাহ্মণ পুরোহিতও থাকে না। কয়লাখনি অঞ্চলের পশ্চিমে বহু লৌকিক দেবদেবীর অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। তবে সারা অঞ্চলজুড়ে দেবী চণ্ডীর কয়েকশো ‘থান’ আছে। এই ধর্মবিশ্বাসের মধ্যেই লুকিয়ে আছে খনিজীবনের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও সামাজিক অবস্থানের স্বরূপ।

খনি অঞ্চলের প্রেক্ষাপটে মাতৃদেবীর সংখ্যায় বেশি। কারণ আশ্রয় ও বিপদনাশের ভাবনা থেকে মাতৃকাশক্তির আরাধনা। পাথুরে খনি অঞ্চলের জীবনের প্রতি পদে পদে বিপদ। খনি গহ্বরে কয়লা কেটে যাদের জীবনের বেশিরভাগটা কেটে যায়, তাদের জীবনের সবটা জুড়েই থাকে অনিশ্চয়তা, অর্থাভাব এবং কঠিন রোগ-বালাই। শিক্ষার আলো থেকে বহুদূরে বসবাস করা এই মানুষগুলির সংকটে তখন একমাত্র আশ্রয় হয় দেবী চণ্ডীর ভাবনা ও পুজো। একই সঙ্গে শাঁওলি মনসা, ধর্মঠাকুর, শিবের লৌকিকরূপের পুজোরও প্রচলন আছে খনি অঞ্চলে।

*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 28*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 238 - 244*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

রাঢ়বঙ্গের পশ্চিমাঞ্চলের অর্থাৎ আসানসোল-রানিগঞ্জ-দুর্গাপুর শিল্পনগরীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা প্রায় প্রতিটি গ্রামেই বা এই অঞ্চলের খনি সংলগ্ন গ্রামে লোকদেবী চণ্ডীর নিজস্ব 'থান' আছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গ্রামদেবী চণ্ডীর পুজো করেন সমাজের অন্ত্যজ সম্প্রদায়। বাউরি, ডোম, মুচি, জেলে, কৈবর্ত সম্প্রদায়ের লোকজন চণ্ডীর আদি উপাসক ও পূজারি। তাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পুজোর উপকরণ মদ, মাংস ও খিচুড়ি। তবে বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মবিশ্বাস ও ভাবনারও বিনির্মাণ হয়। দেবী চণ্ডী অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই শুধু, খনি অঞ্চলের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে চণ্ডীর উপাসনা ও ব্রতর চলও চোখে পড়ে। রাঢ়ের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে বাড়ির মেয়ে-বউরা কয়েক প্রকার চণ্ডীর পুজো করে থাকেন। যেমন বৈশাখ মাসের মঙ্গলবার ধরে হরিশমঙ্গল চণ্ডীর পুজো, আবার জ্যৈষ্ঠমাসের প্রতি মঙ্গলবার ধরে জয়মঙ্গলবার পালন করে মঙ্গলচণ্ডীর পুজো এবং যেকোনো মাসের সংক্রান্তি ধরে মঙ্গলচণ্ডীর পুজো হয়ে থাকে। এই বিশেষ চণ্ডীপুজোগুলি মধ্যবিত্ত পরিবারের দ্বারা আয়োজিত হয়ে থাকে কোনো দুর্গা বা কালিমন্দিরের বেদীর একপাশে ঘটে-পটে। এই পুজোগুলির উপকরণ ও নৈবেদ্য একটু ব্যয়বহুল। তবে উল্লেখিত এই বিশেষ চণ্ডী পুজোগুলি কয়লাখনির বাইরে রাঢ়বঙ্গের অন্য ক্ষেত্রের মধ্যবিত্ত সমাজেও প্রচলিত। এখানে রাঢ়বঙ্গের আলাদা কোনো বিশেষত্ব নেই তবে রাঢ়ের চণ্ডীপুজোর আলোচনার প্রসঙ্গে উপেক্ষণীয়ও নয়। কারণ একই মাটির একই পরিবেশে দেবী চণ্ডীর আরাধনার পার্থক্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিভেদকেও চিহ্নিত করে।

খনি সংলগ্ন বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষত পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং ঝাড়খণ্ডের কিছু এলাকায় অনার্যদের হাতে বিভিন্ন বুড়ি পূজার প্রচলন আছে। যেমন 'ভূতাবুড়ি', 'মনতুশ বুড়ি', 'কুদরাবুড়ি' প্রমুখ দেবী। তবে এই বুড়ির পুজোর কল্পনার সঙ্গে কখনও চণ্ডীর সংমিশ্রণও ঘটেছে। যেমন রাঢ়ের কয়লাখনি অঞ্চলের বিখ্যাত দেবী ঘাঘর বুড়ি চণ্ডী। এঁর অপর নাম ঘাঘর চণ্ডী। আসানসোলের ২ নম্বর জাতীয় সড়কের উত্তর দিকে নুনিয়া নদীর তীরে ঘাঘর বুড়ির মন্দির। বৃক্ষের নীচে সিঁদুরমাখানো তিনটি শিলাখণ্ডের ওপর ধাতুর চোখ লাগানো মূর্তিতে দেবী পূজিতা পুরোহিতের হাতে। কথিত আছে পূর্বে ফাঁকা মাঠের উপর প্রাচীন একটি বৃক্ষের নীচে অনার্যদের হাতে দেবীর প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯৫৬ সালের বন্যায় নুনিয়া নদীর জলে সবকিছু ভেসে গেলে পরবর্তীতে ওই স্থানেই নতুন করে গাছ লাগিয়ে দেবীর পুজো চলতে থাকে। মানুষের মধ্যে ঘাঘরবুড়ি চণ্ডীর প্রতি বিশ্বাস আরও দৃঢ় হওয়ার ফলস্বরূপ চাতাল, বারান্দা, নাটমন্দির তৈরি হয়েছে সম্প্রতি। এই মন্দিরে জাতিধর্মের কোনো ভেদ নেই। এখানে পুরোহিতের মাধ্যমে বলিদানের ব্যবস্থাও আছে। মন্দিরের দেওয়ালের লিপি থেকে জানা যায় মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৬২০ সালে এবং মন্দির প্রতিষ্ঠাতা ও সেবাইতের নাম হিসেবে লেখা আছে নকড়ি রায় ও রামকৃষ্ণ রায়। বর্তমানে ঘাঘরবুড়ী চণ্ডীর জনপ্রিয়তা যে কতখানি তা বোঝা যায় মাঘ মাসের প্রথম দিনে মেলায় ভক্ত সমাগম দেখে। এই দেবীকে কেন্দ্র করে আসানসোলে এক পর্যটন কেন্দ্র গড়ে উঠেছে বলা চলে। 'আসানসোলের পর্যটন কেন্দ্র' প্রবন্ধে এর উল্লেখ পাওয়া যায়—

> "ঘাঘর বুড়ি হলেন বাংলার লৌকিক দেবী। কালীপাহাড়ি আসানসোলের উত্তরে সরু নদী নুনিয়া বয়ে যাচ্ছে। তারই তীরে অধিষ্ঠান করছেন রাঢ় বাংলার জাগ্রত মা শ্রী শ্রী ঘাঘর চণ্ডী দেবী। ... প্রতি বছর পয়লা মাঘ এখানে মেলা বসে। মেলার দায়িত্ব থাকে সাঁওতালদের হাতে। বাংলা-ঝাড়খণ্ড- বিহার থেকে বহু পুণ্যার্থী আসেন মা কে পুজো দিতে। শীতকালে এই মন্দিরের ও নদীর ধারে চড়ুইভাতির জন্য মানুষের ঢল দেখার মতো।"[২]

আসানসোল ও দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে যেমন চাকদোলা, জামসোল, বেলডাঙ্গা— এই তিনটি গ্রামের মাঝে একটি মাঠে এক বটগাছের তলায় দেবী চণ্ডীর পুজো হয়। পাথর-পূজিতা এই দেবীর আকার অনেকটা সাপের ফনার মতো বলে এই দেবী 'নাগরাজ চণ্ডী' নামে আরাধ্যা।

পশ্চিম বর্ধমানের কয়লাখনি অঞ্চলের একটি অখ্যাত স্থান লালগঞ্জ। চিত্তরঞ্জন যাওয়ার পথে এই অঞ্চলটির স্থান। সেখান থেকে কিছু দূর এগোলেই এক টিলার উপর সবুজ গাছে ঘেরা এক স্থানে মনোরম মন্দির স্থাপিত হয়েছে। পাহাড়ের উপরে এই মন্দিরটিতে দেবী চণ্ডী পূজিত হন 'মুক্তাইচণ্ডী' নামে। হাতে তীর-ধনুক নিয়ে দেবী ছয়টি ঘোড়া বিশিষ্ট

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 28*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 238 - 244*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

রথে অধিষ্ঠান করে আছেন। এক সময় ওঁরাও জনগোষ্ঠীর আদিবাসীরা এই অঞ্চলে দেবী 'চাণ্ডীর' পুজো করত। পরবর্তী সময়ে হিন্দু ধর্মের সংস্পর্শে এসে দেবী পরিচিত হয়েছেন 'মুক্তাইচণ্ডী' নামে। কথিত আছে ১৯৬৪ সাল থেকে মাঘী পূর্ণিমার দিন এই মন্দিরের কাছে কীর্তন, কবিগান ও বাউলের আসর বসে— যা কয়লাখনির লোক–ঐতিহ্যকে বহন করে আসছে। এই মন্দিরের গায়ে বা প্রবেশপথে সিংহ, হাতির কাটা মাথা খোদিত অবস্থায় দেখা যায়। হয়তো আদিবাসীদের শিকারের দেবীর রূপ থেকে বিবর্তিত হয়ে বর্তমান রূপ লাভ করেছে বলেই পশুমূর্তিগুলির ভাস্কর্য দেখা যায় মন্দিরগাত্রে।

রানিগঞ্জের কয়লাখনি অঞ্চল সংলগ্ন নারানকুঁড়ি কোলিয়ারির নাম অতি পরিচিত। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁর 'কার অ্যান্ড টেগোর কোম্পানি'র নির্মাণ করেছিলেন দামোদর নদের তীরবর্তী অঞ্চলে। এই অঞ্চলেই দেবী মথুরা চণ্ডীর মন্দির। কথিত আছে দেবী চণ্ডী রূপান্তরিত হয়ে দুর্গার বেশে ধারণ করে দশভূজা রূপে পূজিত হন। এখানে পাশাপাশি দুটো মন্দির অবস্থিত। বড়ো মন্দিরটিতে আছে শিব, চণ্ডী, শীতলা ও ভৈরবনাথের মূর্তি। পাশের ছোটো মন্দিরটিতে আছে বাঘ রায়ের মূর্তি। এই বাঘ রায় এখনও আদিবাসীদের হাতে পুজো পেয়ে থাকেন। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সঙ্গে লৌকিক সংস্কৃতির মিশ্রণ ঘটেছে এভাবেই। মকর সংক্রন্তিতে মথুরা চন্ডীর পুজোকে কেন্দ্র করে মেলা বসে এই অঞ্চলে। এই মন্দিরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আরও একটি ইতিহাস। দামোদরের তীরে প্রাচীন কোলিয়ারির ভগ্নপ্রায় অবস্থার মাঝে দাঁড়িয়ে আছে আজও প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের জেটি, যার মাধ্যমে একসময় জলপথে কয়লা পরিবহন হত।

সমাজ যত এগিয়ে যাবে তার গ্রহণ ও বর্জনের হিসাব ততই বাড়বে। আধুনিক শিল্পনগরী দুর্গাপুর নতুনত্বের ছাপ নিয়ে চলে সর্বদা। নতুন ও পুরাতনের সংমিশ্রণে এখানে জন্ম নিয়েছে মিশ্রসংস্কৃতি। শহরের মাঝে মাঝেই পিচরাস্তা ধরে এগোলে এক-একটি প্রাচীন গ্রাম খুঁজে পাওয়া যায়। খুঁজে পাওয়া যায় প্রাচীন লৌকিক দেবদেবীদের অস্তিত্বকে। দুর্গাপুরের পশ্চিমদিকে ইছাপুরের কাছাকাছি 'হেথাদোহা' গ্রামের লোকদেবী 'হেথাইচণ্ডী'। এই গ্রামের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে হেথাইচণ্ডীর থান। শিল্পায়নের অগ্রগতির সাথে সাথে সমাজ-সংস্কৃতির পরিবর্তন হলেও এই গ্রামগুলি আদিবাসী অধ্যুষিত জনপদ এখনও। এই আদিবাসীদের হাতেই ঝোপঝাড় ও বনস্পতির ছায়ায় মা হেথাইচণ্ডী পুজো পেয়ে আসছেন। দেবীর মূর্তি বলতে ভাঙাচোরা কয়েকটি পাথর তেল ও সিঁদুর দিয়ে মাখানো। দেবী রোগের মুক্তিদাতা এই বিশ্বাসে অস্তিত্বশীল। প্রতি রবিবার ভক্তরা আসেন দেবীর থানের ঔষধ নিতে। পুরোহিতেরা কলার মধ্যে জঙ্গল থেকে নিয়ে আসা ভেষজদ্রব্য পুরে ভক্তদের গিলে খাওয়ার নির্দেশ দেন রোগমুক্তির উপায় হিসেবে। বিনিময়ে দেবীর পুজো দিতে হয় ঘটা করে। এর সুস্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায় ড. ফণী পালের এক আলোচনায়—

> "হেথাই চণ্ডী থানের উঁচু জমির চারপার্শ্বের নিম্ন ভূমি। ঐ নিম্নভূমি সংলগ্ন আছে একটি বড়ো জলাশয়, প্রায় সরোবরের মতো বিশাল। বর্ষার সময় সরোবর উপচিয়ে জল সারামাঠকে প্লাবিত করে। তখন অঞ্চল প্রায় সাগরের রূপ ধারণ করে। তখন বিস্তির্ণ জলরাশির মধ্যেও জেগে থাকে কেবল হেথাই চণ্ডীর থান।"[৩]

গবেষক ও আলোচকদের কাছে এই দেবীর নামের উৎস নিয়ে একটি মতভেদ থাকলেও ধরে নেওয়া হয় যে 'হেথাই চণ্ডী' আসলে 'হিত দায়িনী চণ্ডী'। লোকশ্রুতি থেকে অনুমান করা যায় এই দেবী ভক্তদরদী ও প্রসন্ন। তবে এই দেবীর পুজোর একটি বৈশিষ্ট্য হল স্পষ্টভাবে বর্ণভেদ প্রথাকে টিকিয়ে রাখা। মাঘ মাসের পয়লা এখানে হিতাই দেবীর মেলা বসে। কোলিয়ারি সংলগ্ন বারো থেকে পনেরটি গ্রাম অর্থাৎ জামুরিয়া, কমলপুর, ঝাঁঝরা, ইছাপুর প্রভৃতি গ্রামের মানুষ ভিড় করেন এই মেলায় ও দেবীর থানে। মেলার দিনে বলিদান একটি বিশেষ পর্ব থাকে। উচ্চবর্ণের ভক্তরা মানসিক উপলক্ষ্যে ছাগল বা মেষ বলি দিয়ে থাকেন এবং তারা দেবীর মূল যে দেবস্থান সেখানেই পুজো দিয়ে থাকেন। অন্যদিকে নিম্নবর্গের মানুষেরা বলির উপকরণ হিসেবে শুয়োর ও মুরগি দিতে পারে এবং তারা পুজোর ব্যবস্থা করে হেথাই দেবীর থানের পাশে ঝোপের মধ্যে কোনো গাছের তলায়। পুরোহিতের বদলে নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত 'দেয়াসী'রা পুজো করে থাকেন। অর্থাৎ মূল দেবস্থানে বর্ণ হিন্দুদের সঙ্গে অন্ত্যজ শ্রেণির একাসনে বসে পুজো করার কোনো স্বীকৃতি নেই। এভাবেই খনি অঞ্চলের বুকে লৌকিকবিশ্বাস ও সংস্কার একরৈখিক ভাবে চলমান।

দামোদর নদীর ধারে রানিগঞ্জ কয়লাখনির কাছে নূপুর গ্রামটি অতীত ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহন করছে আজও। কয়েকটি বনেদি মন্দির, জমিদারি কিছু প্রথা ও প্রাচীন ধর্মবিশ্বাস ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে গ্রামের নানা স্থানে। বহু লৌকিক দেবদেবীর সঙ্গে মা চণ্ডীও এখানে পুজো পেয়ে আসছেন। গ্রামের উত্তর দিকে 'চণ্ডীডাঙ্গা' নামক স্থানে আঁকড় গাছের নীচে মা চণ্ডীর অবস্থান। এখানে বিশেষ পুজোর দিনটি হল চৈত্র মাসের মঙ্গলবার। কিছু মাটির হাতি-ঘোড়া ও ত্রিশূলের মধ্যে মা চণ্ডীর অস্তিত্ব বিরাজ করছে।

রাঢ় অঞ্চলের পশ্চিমের একটি (প্রায়) শহর হল দুবরাজপুর। সেখানে বটবৃক্ষের নীচে বিশেষ বিশেষ দিনে 'ঝাপাই চণ্ডী'র পুজো হয়। গোলাকার বৃহৎ পাথরে সিঁদুরলেপা লৌকিক দেবতা এই চণ্ডী সপর্কে জনশ্রুতি আছে ব্রিটিশ আমলে ধান ব্যবসায়ীরা এই পাথরকে পরিমাপক হিসেবে ব্যবহার করতেন। হঠাৎ করে পুলিশের ধরাধরি শুরু হলে ব্যবসায়ীয়া ওই পাথরগুলিকে সিঁদুর লাগিয়ে বটগাছের তলায় রেখে দেওয়ার পর থেকে স্থানীয় মানুষের হাতে 'ঝাপাই চণ্ডী' পুজো পেয়ে আসছেন।

খনি অঞ্চলের পার্শ্ববর্তী একটি প্রাচীন জনপদ হল পাণ্ডবেশ্বর গ্রাম। কথায় আছে অজয় নদের তীরবর্তী এই অঞ্চলে মহাভারতের পঞ্চপাণ্ডবেরা অজ্ঞাতবাসের সময় কিছুদিন কাটিয়েছিলেন এবং পাঁচটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেই থেকে এই অঞ্চলের নাম পাণ্ডবেশ্বর। প্রায় ২০০ বছর আগে এই অঞ্চল ছিল ঘন শালের জঙ্গলে ভরা। জনশ্রুতি থেকে জানা যায় বহুযুগ আগে কোনো এক সাধক এই জঙ্গলে ধ্যান করার সময় ধ্যানযোগে দেবী চণ্ডীর প্রস্তরমূর্তির সন্ধান পেয়েছিলেন। শালের জঙ্গল থেকে সেই মূর্তি উদ্ধার করে সেখানেই তিনি চণ্ডীপুজো শুরু করেন। সাধকের নাম থেকে দেবীর নাম হয় 'নোটন চণ্ডী'। বর্তমানে এই দেবী মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত পাণ্ডবেশ্বর থেকে ২ কিলোমিটার দূরে খোট্টাডিহি গ্রামে। কয়লাখনন ও কোলিয়ারি স্থাপনের জন্য সুদীর্ঘ শালবন কেটে ফেলা হয়। পাণ্ডবেশ্বর কয়লাখনিকে কেন্দ্র করে জনবসতির প্রতিষ্ঠা হওয়ায় দেবী 'নোটনচণ্ডীর'ও পুজো হয়ে আসছে নিয়মিত।

কয়লাখনির অঞ্চল ছাড়াও রাঢ় অঞ্চলের প্রায় প্রতিটি গ্রামেই চণ্ডীপুজো হয়। কাঁকসা থানার অন্তর্গত বান্দড়া গ্রামে যে চণ্ডী পুজো হয় তার নাম 'পাদরাই চণ্ডী'। লোকবিশ্বাস অনুযায়ী অপদেবতার হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করতেই এই চণ্ডী পুজো করা হয়। দেবীর স্থান এখানেও আঁকড় গাছের নীচে ঝোপ-জঙ্গলে পরিবৃত।

> "পূজা হয় ভৈরবের ধ্যানমন্ত্রে। এই পূজার প্রধান দ্রব্য বা ভোগ হল মুনাই। ... পাদরাই চণ্ডী নামে স্ত্রীদেবতা হলেও ধ্যানমন্ত্রের ক্ষেত্রে পুরুষদেবতা ভৈরবমন্ত্রে পূজিত হন।"[৪]

প্রতি চণ্ডীরই এই রকম একটি করে বিশেষত্ব আছে। পুজোর প্রসাদ এক বিশেষ ধরণের পায়েস বা 'জুরি প্রসাদ' বা 'মুনাই' যা কাঠের জ্বালেই একমাত্র রান্না করতে হয়। ছাগবলিও হয়ে থাকে মাঝে মধ্যে। দেবীর ভক্তরা নিম্নবর্গের মানুষজন হলেও পুজো করেন ব্রাহ্মণ পুরোহিত।

কয়লাখনি অঞ্চলের থেকে আরও কিছুটা এগিয়ে গেলে রাঢ়বঙ্গের আরও এক জেলা পুরুলিয়ার অন্তর্গত খেজুরিয়া ডাঙা নামক একটি মধ্যে বৃহৎ প্রস্তর খন্ডের ওপর প্রস্তর খন্ড দিয়ে ঘেরা এক কক্ষে এক মূর্তি 'খেলাই চণ্ডী' রূপে পূজিত হন। প্রতি বছর ১লা মাঘ এখানে খেলাইচণ্ডীর পুজো হয়। শ্যামল চট্টোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থে এই দেবীর বর্ণনা দিয়েছেন –

> "রাঢ় অঞ্চলের চণ্ডীর মূর্তি অনেক জায়গায় বুড়ির থান নামে পরিচিত। ১লা মাঘের পরের দিন এখানে জুরি পায়েস, খিচুরি দিয়ে ভোগ নিবেদন করা হয় এবং পাঁঠাবলি হয়। পাঁঠাবলি খেলাই চণ্ডীর থান থেকে কিছু দূরে গড়নিম গাছের তলায় হয়। ...এটি প্রায় ১৫০ বছরের পুরাতন থান।"[৫]

এই লৌকিক বিশ্বাসের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে লোক-সংস্কৃতিও। খেলাইচণ্ডীর পুজোকে কেন্দ্র করে যে মেলা বসে তার উপলক্ষ্যে বসে ছৌনাচ ও নাচনি নাচের আসর বসে। পুরুলিয়া জেলার পাশাপাশি বাঁকুড়া জেলাতেও এমন অনেক 'বুড়ির থান' লৌকিক বিশ্বাসে পূজিত হয়ে আসছে। তাঁর মধ্যে কোনো কোনো বুড়ির থান চণ্ডী হিসেবেও পূজিত। যেমন বাঁকুড়ার

মটুকবনী গ্রামের গ্রামদেবতা বাঁকাবুড়ির থান থেকে পায়ে হেঁটে যে থান দেখা যায় তা হল 'মঙ্গলা চণ্ডী বুড়ি'র থান। গাছ দিয়ে ঘেরা ও পাথরের ঢালায় দিয়ে তৈরি এই চণ্ডী থান। ভিতরে সিঁদুরমাখান একটি পাথর এবং কয়েকটি পোড়া মাটির ঘোড়াতে পুজো করা হয়। নানা রকমের ফল, বতাসা, গুড়, চিঁড়ে, মুরকি ইত্যাদি নিবেদন করা হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে এই চণ্ডীমা প্রায় আড়াইশো বছর ধরে পুজো পেয়ে আসছেন।

রাঢ়ের কয়লাখনি অঞ্চলে এই রকম বহু লোকজ দেবীভাবনা আনাচে কানাচে ছড়িয়ে আছে কখন উপজাতি সমাজে, কখনো খনি শ্রমিকদের মধ্যে শ্মশানবাসিনী কিছু ভয়ংকরী দেবী আরাধ্য। রাঢ় অঞ্চলে এই ভয়ংকর মাতৃকার উপাসনা এই অঞ্চলের লৌকিক বিশ্বাসের ধারাকে বৈচিত্র্য দান করেছে। এভাবেই হয়তো কয়লাখনির প্রাচীন অধিবাসীদের মধ্যে দেবী চণ্ডীর রূপ বিবর্তিত হয়ে চামুণ্ডাও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে বিক্ষিপ্ত ভাবে।

কয়লাখনির অঞ্চলের মানুষ ক্ষেত্রপূজা, বৃক্ষপূজা, নাগপূজা, পাথর-পূজিতা দেব-দেবীর মাধ্যমে ধর্ম চর্চার প্রচলন অব্যাহত রেখেছে। শুধু শ্রমিক বা উপজাতিদের মধ্যেই নয় গোপ ও সদ্‌গোপ সম্প্রদায়ের মধ্যে পাথরের রূপে চণ্ডীর ধ্যান হয়ে থাকে। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে 'মালঞ্চ চণ্ডী'র পুজো প্রচলন আছে। গাছের তলায় এই দেবীর আটন পেতে পোড়া মাটির পুরোনো কিছু হাতি ঘোড়ার পুজো করা হয় চণ্ডিকা দেবীর মন্ত্রে। এই মালঞ্চচণ্ডী সর্বসাধারণের দেবী হলেও মূলত অব্রাহ্মণদের মধ্যে এই পুজোর চর্চা বেশি দেখা যায়। পূজারীদের মতে এই দেবী চণ্ডীর মন্ত্রে তুষ্ট হন। পশ্চিম বর্ধমানের চিঁচুরিয়া গ্রামে মালঞ্চ শস্যের দেবী রূপে স্বীকৃত।

ছোটোনাগপুর মালভূমির দামোদর নদ পার হয়ে যে অংশ মধ্য রাঢ় নামে পরিচিত স্থানেও লৌকিক চণ্ডীদের এক বিশাল সাম্রাজ্য দেখা যায়। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের রক্ষাকর্তা ও রোগ নিরাময়ের আধার হিসেবে লৌকিক বিশ্বাসে এই চণ্ডীরা যাপন করছে আজও মানুষের মনে। কয়লাখনি অঞ্চল থেকে একটু দূরে বর্ধমান সংলগ্ন খন্ডঘোষ থানার অন্তর্গত বোঁয়াই অঞ্চলে লোকদেবী 'বোঁয়াই চণ্ডী' পূজিত হন। প্রধানত কলেরা ও বসন্ত রোগের প্রতিরোধক শক্তি হিসেবে এই দেবীর পুজোর ব্যবস্থা হয়ে আসছে। বসন্তরোগ যখন মহামারীর আকার নিয়েছিল থেকে এই দেবীর পুজো হয় বলে এঁর নাম 'বসন্তচণ্ডী' বা 'বসনচণ্ডী'। আগেও বলেছি যে একই ভাবধারায় প্রতিষ্ঠিত হলেও প্রতিটি স্থানের চণ্ডীর একটি আলাদা বিশেষত্ব আছে। যেমন বোঁয়াইয়ের এই বসন্তচণ্ডীর সঙ্গে বর্ধমানের রাজপরিবারের একটি গল্প সংযুক্ত হয়ে আছে। বর্ধমান রাজার কোনো এক আত্মীয় বসন্তরোগে ভয়াবহভাবে আক্রান্ত হলে দেবীর স্বপ্নাদেশে এখানে পুজো দেওয়ার কথা বলেন। রাজার আত্মীয় সুস্থ হলে রাজা দেবীর উদ্দেশ্যে মন্দির তৈরি করে দেন এবং বহু জমি দান করেন। এভাবেই একই লোকবিশ্বাসে সংমিশ্রণ হয়ে যায় ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তের।

বর্ধমান শহর থেকে কিছুটা দূরে আউশগ্রামে ছায়াঘন গাছের নীচে আছেন 'নীলাভ চণ্ডী' বা 'নিলাইচণ্ডী'। জঙ্গলাকীর্ণ ক্ষেত্রই চণ্ডীদের পছন্দের স্থান। নিলাই চণ্ডীর জন্য মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে গেলে স্বপ্নাদেশে দেবী বাধা দান করেছিলেন বলে শোনা যায়। দেশভাগের সময় উদ্বাস্তুদের আগমনে দেবী জঙ্গলের মাঝেও জনবসতি পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকেন।

বর্ধমান সংলগ্ন ভাতাড় গ্রামেও দেবী চণ্ডীর আড়ম্বরপূর্ণ পুজো প্রচলন আছে। ভাতাড়ের এরুয়ার নামক স্থানের কাছে 'কুলাই চণ্ডী'র প্রাচীন মন্দির ছিল এবং পরে বর্গী আক্রমণের ভয়ে দেবীর স্থানান্তর হয় পাশ্ববর্তী বিষ্ণুপুর গ্রামে। ইনি পারিবারিক চণ্ডী। ভাতাড়ের মুখার্জী পরিবারের হাতে কষ্টিপাথরে খোদিত মূর্তিতে দেবীর পুজো শুরু হয়। বিশেষ পূজানুষ্ঠানে দেবীকে কোলে নিয়ে গ্রাম পরিক্রমার সময় অন্য গ্রামের লোকেরা দেবীর শ্রীমূর্তি দেখে কাড়াকাড়ি শুরু করলে দেবী দ্বিখণ্ডীত হয়ে যান। কুলচন্ডা গ্রামের লোকেরা দেবীর ঊর্ধাঙ্গ নিয়ে এলে পূজক মুখার্জী পরিবার কুলচন্ডা গ্রামে গিয়ে ঘট স্থাপন করেন। সেই থেকে দেবীর নাম কুলাই চণ্ডী হয়। এখনও দেবীর নিত্য অন্নভোগ নিবেদনের মাধ্যমে নিত্যসেবা হয়।

অজয় নদীর দক্ষিণে নতুনহাটে অধিষ্ঠিতা দেবী মঙ্গলচণ্ডীর সঙ্গে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ধনপতি – শ্রীমন্তের কাহিনির যোগ আছে বলে মনে করা হয়। জনশ্রুতি অনুযায়ী এই স্থানেই ধনপতি সদাগরের দ্বিতীয় স্ত্রী খুল্লনা সতীন জ্বালায় জর্জরিত হয়ে লহনা কর্তৃক অত্যাচারিত হয়ে ছাগল চড়ানিতে পরিণত হয়েছিল এবং খুল্লনায় একদিন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে নদীর তীর বরাবর নতুনহাট বা নমোহাটের মঙ্গলচণ্ডীর আটনের কাছে এসে হাজির হয়। বর্তমানে এই চণ্ডীর পুজো মহাসমারোহে

অনুষ্ঠিত হয় দোল পূর্ণিমার দিন। দশমীর দিন দেবীর বিশেষ পুজো এবং অগ্রহায়ণ মাসে বাগদী সম্প্রদায় নবান্ন উপলক্ষ্যে দেবীর পুজো করে থাকে। এই মঙ্গলচণ্ডী একই অঙ্গে দুর্গা-চণ্ডী-শস্যদেবী।

রাঢ় অঞ্চলের গ্রামে-গঞ্জে এই রকম আরও বহু চণ্ডীকথা ছড়িয়ে আছে। আসলে 'রাঢ় অঞ্চল হল চণ্ডীদের সাম্রাজ্য'। কতযুগ আগে থেকে এই চণ্ডীরা বৃক্ষতলে-জঙ্গলে নিজের অস্তিত্বকে ধরে রেখেছে। খনি অঞ্চলের মানুষদের বিপদসংকুল জীবনের মানসিক সহায় হয়েছে চণ্ডীরা। হয়তো লৌকিক বিশ্বাসে তাঁরা বেঁচে থাকবেন আরও অনেক কাল কিন্তু চারিদিকে খোলামুখ খনির সম্প্রসারণের কারণে প্রকৃতি সদা পরিবর্তনশীল। তাই অনেক দেবস্থানের স্থান পরিবর্তন হয়েছে। তারই মধ্যে লৌকিক দেবদেবীরা এখনও পর্যন্ত পুজো পেয়ে চলেছেন। পরবর্তীতে এঁদের অস্তিত্ব নিয়ে সন্ধিহান গবেষকরা।

## Reference:

১. চট্টোপাধ্যায়, অমর, *আসানসোল-দুর্গাপুর অঞ্চলের ইতিবৃত্ত ও তার লোক সংস্কৃতি*, যোধন প্রকাশনী, পশ্চিম বর্ধমান, ১ম প্রকাশ, ২০১৩, পৃ. ৭২

২. মুখোপাধ্যায়, কাজল, *আসানসোল ইতিহাস ও সংস্কৃতি*, (সম্পা.) তারাপদ হাজরা, ঐক্য প্রকাশন, ২০২১, পৃ. ৩০৩

৩. ড.পাল, ফণী, *প্রান্তিক রাঢ়ের দেবদেবী*, (সম্পা.) তারাপদ হাজরা, ঐক্য প্রকাশন, পশ্চিম বর্ধমান, ২০১৯, পৃ. ৮৩

৪. হাজরা তারাপদ, *প্রান্তিক রাঢ়ের দেব-দেবী* (সম্পা.), তারাপদ হাজরা, ঐক্য প্রকাশন, পশ্চিম বর্ধমান, ২০১৯, পৃ. ১৩০

৫. চট্টোপাধ্যায় শ্যামল, *রাঢ় বাংলার পাথর-পূজিতা বুড়ির থান*, আলপনা প্রকাশন, দুর্গাপুর, ২০১৯, পৃ. ৬৩

## Bibliography:

চৌধুরী কামিল্যা মিহির, 'রাঢ়ের জনজাতি ও লোকসংস্কৃতি' বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান, ২০০৬।

হাজরা তারাপদ, *প্রান্তিক রাঢ়ের দেব-দেবী* (সম্পা.), ঐক্য প্রকাশন, পশ্চিম বর্ধমান, ২০১৯।

পশ্চিম বর্ধমান ও পার্শ্ববর্তী খনি অঞ্চলে ক্ষেত্রসমীক্ষা ও স্থানীয় মানুষজনদের মৌখিক বিবরণ।